বনদস্যুদের গডফাদাররা কে কোথায়

নৃশংস বনদস্যু মিয়া শিকদার ধরা দিয়েছে জনরোষ থেকে বাঁচার আশায়

রিপোর্ট **বদরুল আলম নাবিল**

চরজব্বর উপজেলার শিক্ষিত যুবক এমরান দিনের কাজ সেরে সন্ধ্যার পরপরই বাড়ি ফেরেন নববধূকে সঙ্গ দেয়ার জন্য। কিছু সময় পড়ে রাতের খাবার সেরে বিছানায় হেলান দিয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে বউয়ের বানানো পান চিবুচ্ছিলেন, গরম পড়ছিল তাই বউ হাতপাখা চালাচ্ছিল। দু'জনের মধ্যে নরম সুরে কথা বিনিময় হচ্ছিল। হয়তো তারা ভবিষ্যতের জন্য সোনালি স্বপ্নের জাল বুনছিল। এমন সময় বনদস্যু লিডার বাশার মাঝির গ্রুপের একটি উপদলের কমান্ডার মিয়া শিকদার তার বাহিনী নিয়ে এমরানের বাড়ি ঘেরাও করে। এরপর লাথি দিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে এমরানের দু'পা রশি দিয়ে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে, পা উপরে মাথা নিচে। এরপর ৪-৫ জন বিভিন্ন রকম ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকে। এতে এমরানের শরীর থেকে মাংস টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তে থাকে। তার আর্তচিৎকারে কেঁপে ওঠে পুরো গ্রাম। কিন্তু কার সাহস আছে এ বর্বর দস্যুদের বাধা দেয়। অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ দেখে যখন দস্যুরা নিশ্চিত হয় এমরান আর বাঁচবে না তখন ফেলে রেখে চলে যায়। বাঁধন খুলে তাকে ভ্যানগাড়িতে করে পার্শ্ববর্তী পল্লী

নোয়াখালির বনাঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েকটি গণকবর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্থিগুলো বর্বর বনদস্যুদের নৃশংতার সাক্ষি হয়ে আছে

বনদস্যুদের আস্থানাগুলো ক্ষুব্ধ জনতা ভেঙে গুঁড়িয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে

চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় অসহায় স্ত্রী এবং ভাই। কিন্তু তার আগেই নিভে গেছে এমরানের জীবন প্রদীপ।

এমরানের অপরাধ, গরিব-দুঃখী মানুষের দুঃখ-কষ্টে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বন্দবস্তপ্রাপ্ত খাস জমির দখল নিতে গিয়ে তার গ্রামের যেসব ভূমিহীন জোতদার এবং শিল্পপতিদের মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছেন, তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। নিজের সাইকেল বিক্রির টাকা দিয়ে তাদের জামিনে এনেছেন।

এমরানের মতো কত যুবক যে নোয়াখালীর ১ লাখ একর বনাঞ্চলে বনদস্যুদের নৃশংসতার শিকার হয়ে প্রাণ দিয়েছেন তার হিসাব কারো জানা নেই। ওরা কাউকে পিটিয়ে মেরেছে, কাউকে গাছের সঙ্গে ফাঁসি দিয়েছে, কাউকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে, কাউকে আবার আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে।

তবে পুরুষদের চেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে নারীরা। এই গহিন বনে এসে আশ্রয় নিয়েছে হাতিয়া, মনপুরা, ভোলা, রামগতি, সন্দ্বীপসহ বিভিন্ন এলাকায় ১৫ থেকে ২০ হাজার ভূহিহীন পরিবার। এ পরিবার-গুলোর মধ্যে এমন পরিবার খুঁজে পাওয়া কষ্টকর যে পরিবারের বউ এবং মেয়ে বনদস্যুদের গণধর্ষণের শিকার হয়নি।

দস্যুরা ৫-৭ জন দলবেঁধে এসে বাবা-ভাই অথবা স্বামীকে বলত, পুলিশ আসছে আমরা তোমার ঘরে পালিয়ে থাকবো, তুমি রাস্তায় গিয়ে পাহারা দাও পুলিশ এদিকে আসে কি না। এভাবে পরিবারের পুরুষটিকে বের করে দিয়ে ৫-৭ জন একে একে নারী এবং কিশোরীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। কখনো কখনো বাবা, ভাই বা স্বামীর সামনেই ধর্ষণ করত। প্রতিবাদ করার সাহস কারোর নেই, তাহলে জীবন দিতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনের ধারনা গত ২ বছর কমপক্ষে ২ হাজার নারী দস্যুদের লালসা শিকার হয়েছে।

নদী ভাঙায় সব হারানো মানুষগুলো প্রায় এক দশক যাবৎ বনদস্যুদের অত্যাচার মুখ বুজে সহজ্য করে আসছিল। লাশের পর লাশ পড়েছিল, ধর্ষণের মহোৎসব চলেছে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, রাজনৈতিক নেতা এবং সমাজপতিরা ছিল নির্বিকার। আসলে তারা নির্বিকার বললে ভুল হবে। কারণ নেপথ্যে থেকে এরাই বনদস্যুদের রসদ জুগিয়ে যাচ্ছিল। নোয়াখালীর চরজব্বর থানার ওসি হাবিবুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে সে কথাই বলেছেন, 'কয়েকজন শিল্পপতি এবং রাজনৈতিক নেতা বনদস্যুদের অর্থ, অস্ত্রসহ সব রকম সহায়তা দিয়ে আসছিল। বনদস্যুদের মাধ্যমেই তারা সরকারি খাস জমি দখলে নিয়েছে। সমাজপতিদের কারো কারো প্রত্যক্ষ মদদেই গড়ে উঠেছিল দস্যুবাহিনীগুলো।'

নব্বই দশকের গোড়ার দিকে খাস জমি দখল এবং কোটি কোটি টাকার বনসম্পদ লুটকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে এ বাহিনীগুলোর। নোয়াখালী সদর, চরজব্বর এবং হাতিয়া এলাকার অর্ধলক্ষ একর বনাঞ্চল ৫টি বাহিনী নিজেদের মধ্যে অলিখিত ভাগ করে নেয়।

চরলক্ষির প্রায় ৮ হাজার একর বনভূমি ছিল বনদুস্য নব্যাচোরার নিয়ন্ত্রণে। বনের বিভিন্ন অংশের গাছ কেটে সে প্রায় ৯ হাজার ভূমিহীন পরিবার বসিয়েছিল। চরজিয়া, চরমহিউদ্দিন ও দক্ষিণ বাগ্গা এলাকার ৩টি বনাঞ্চল ছিল শফি বাতাইন্যার দখলে। সে বন কেটে ১৫শত ভূমিহীন পরিবার বসিয়েছিল প্রত্যেক পরিবার থেকে ১০ হাজার টাকা করে নিয়ে। এরপর প্রতিমাসে আরো ২শ টাকা করে নিত। আরেক বনদস্যু বাশার মাঝির নিয়ন্ত্রনেছিল চরনোঙ্গলিয়ার বিশাল বনাঞ্চল। প্রায় ৩ হাজার পরিবার বসিয়ে ছিল টাকা নিয়ে। সবচেয়ে নৃশংস এই বনদস্যু শতাদিক মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে বলে ধারণা করা হয়।

প্রায় ১ হাজার একরের একটি বিচ্ছিন্ন ভূখন্ড ভয়ের চর, এখানে বাস করে প্রায় ৩ হাজার পরিবার। এদের ভাগ্যবিধাতা দস্যু সেলেমান কমান্ডার। এই সোলেমান কমান্ডারের

ওরা কাউকে পিটিয়ে মেরেছে, কাউকে গাছের সঙ্গে ফাঁসি দিয়েছে, কাউকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে, কাউকে আবার আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে

পুলিশ, বিডিআর এবং জনতা বনে যাচ্ছে দস্যু নিধন অভিযানে

জনতা পিটিয়ে মেরেছে ৪১ দস্যুকে। চোখ তুলে দিয়েছে আরো অর্ধশতের

'দস্যুদের পৃষ্ঠপোষকদেরও পরবর্তী পর্যায়ে ধরা হবে'

মেজবাহ-উন-নবী *পুলিশ সুপার, নোয়াখালী*

সাপ্তাহিক ২০০০ : বনদস্যু নিধন অভিযান কত দিন চলবে?

মেজবাহ-উন-নবী : যত দিন অভিযান প্রয়োজন থাকবে ততদিনই চলবে।

২০০০ : বনদস্যুদের আপনারা ধরছেন, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠপোষকরা আপনাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

মেজবাহ-উন-নবী : এখন আমরা তাদের ধরছি যারা সরাসরি দস্যুপনা করতো। এদের ধরা শেষ হলে আমরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদেরও ধরবো। আমাদের কাছে নানা রকম তথ্য আছে। আরো তথ্য আসছে, তাদের ছাড়া হবে না।

২০০০ : পুলিশ প্রশাসনের কেউ কেউ দস্যুদের অতীতে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে বলে অভিযোগ আছে।

মেজবাহ-উন-নবী : এরকম অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবশ্যই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গডফাদার হিসেবে হাতিয়ার এমপি মোহাম্মদ আলীর নাম শোনা যায়।

বনদস্যুরা বনে থাকলেও তাদের গডফাদারা কিন্তু বনে থাকেন না। তারা থাকেন শহরে বা শহরতলীতে ভদ্রবেসে।

বনদস্যুরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তুলেছিলো। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জাহাঙ্গীর ডাকাতের বাহিনীতে সর্বাধিক প্রায় ৪০০, বাশার মাঝির বাহিনীতে প্রায় ৩৫০, এবং নইব্যা চোরার বাহিনীতে দেড়শ'র মতো সন্ত্রাসী সদস্য রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এরা প্রত্যেকেই বাহিনী সর্দারের বেতনভুক্ত। সাধারণ সদস্যদের দৈনিক ১০০ টাকা করে দেয়া হতো, সঙ্গে তিন বেলা খাবার। কৃষকের গোয়াল থেকে গরু এবং খাসি গোলা বা ক্ষেতে থেকে ধান লুট করে এনে তা দিয়ে খাওয়ানো হতো। দস্যুদের আরো আয়ের উৎস হলো বনের গাছপালা কেটে বিক্রি করে দেয়া, যার যার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় একেকটি ভূমিহীন পরিবার বসানোর বিনিময়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা করে নেয়া পরিবারপ্রতি মাসিক আরো ১০০ টাকা চাষযোগ্য জমি প্রতি একরের জন্য নিত বছরে ৩০০-৫০০ টাকা। এছাড়া এলাকায় চাঁদাবাজি এবং নৌপথে ট্রলার, কার্গোতে কোটি কোটি টাকা ডাকাতি। প্রত্যেকটি বাহিনীর সদস্যদেরই আছে আলাদা ধরনের ইউনিফর্ম। নোয়াখালীর দুর্গম বনাঞ্চলে ওরা গড়ে তুলেছিল এক ভিন্ন জগৎ। সেখানে দস্যু সর্দারদের ইচ্ছাই আইন। তার মতে, বিরুদ্ধে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। প্রশাসন সেখানে অচল, পুলিশ এবং দস্যুদের মধ্যে চলত ক্যাট এন্ড মাউস খেলা।

'নতুন কোনো বাহিনীর উত্থান ঘটতে দেয়া হবে না'

মোঃ শাহজাহান *সংসদ সদস্য, নোয়াখালী-৪ (সদর)*

সাপ্তাহিক ২০০০ : বনদস্যু নিধন অভিযান যেভাবে চলছে, সরেজমিনে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে এভাবে দস্যুদের পুরো নির্মূল করা সম্ভব নয়।

মোঃ শাহজাহান : আমি আপনার সঙ্গে একমত। আমাদের স্ট্যাটেজি পরিবর্তন করতে হবে। এতে পুরোপুরি সাফল্য আসবে না। ওরা গভীর বনে পালিয়ে আছে, এভাবে ধরা সম্ভব নয়।

২০০০ : বনদস্যুদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যারা সুপরিচিত তাদের অনেকে এখন দস্যু দমনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাদের এই সুযোগ দেয়া হলো কেন? তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিবেন?

মোঃ শাহজাহান : গাজী মেম্বার, বুল, রেনু মেম্বার, সাহাবুদ্দিন, সেলিম চেয়ারম্যানসহ যাদের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ আছে তারা কেউ নেতৃত্বে নেই। এদের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয় তবে ব্যবস্থা অবশ্যই নেয়া হবে।

২০০০ : দস্যুদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এমন অনেকের নাম এসেছে যারা আপনার ঘনিষ্ঠ। এতে দস্যুদের প্রতি আপনার পরোক্ষ সমর্থন ছিল বলে মনে করা যায় না?

মোঃ শাহজাহান : হ্যাঁ, আমার দলের কারও কারও নাম শোনা যায়। তবে দস্যুদের আমি হলাম প্রধান শত্রু। এর আগেও কয়েকবার অভিযান চালিয়েছি। কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারিনি এবং স্থানীয় মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পারিনি বলে তা সফল হয়নি। এবার যা সম্ভব হয়েছে।

২০০০ : দস্যুদের তাদের আস্তানা থেকে উচ্ছেদ করে আপনারা কিছুটা সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু যারা গহিন বনে পালিয়ে গেছে তারা সংগঠিত হয়ে আবার এলাকাবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাদের রক্ষা করবেন কিভাবে?

মোঃ শাহজাহান : প্রয়োজনীয় সবক'টি জায়গায় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসানো হচ্ছে এবং টহল চলতে থাকবে সর্বত্র। তারপরও এই বিশাল বনাঞ্চলের সর্বত্র পুলিশ রাখা অসম্ভব। তবে বনগুলো এখনও দুর্গম। আমরা রাস্তাঘাট তৈরি করছি যাতে পুলিশ এবং প্রশাসন সহজে সর্বত্র যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, নোয়াখালীর এ অঞ্চলে যে বিশাল এলাকা জুড়ে খাস জমি আছে, এই খাস জমির নিয়ন্ত্রণ এবং বনসম্পদ লুটের জন্য দস্যুবাহিনী গড়ে উঠেছিল। তারাই জমি বন্দোবস্ত দিত। প্রশাসনের কর্তৃত্ব ছিল না। এটা আমরা পুরোপুরি পাল্টে ফেলতে চাই। যেসব এলাকায় বন নেই সেসব এলাকায় ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে এবং বাকি জমি চিংড়ি চাষের জন্য দেয়া হবে। এতে সরকারের রেভিনিউ আয় হবে।

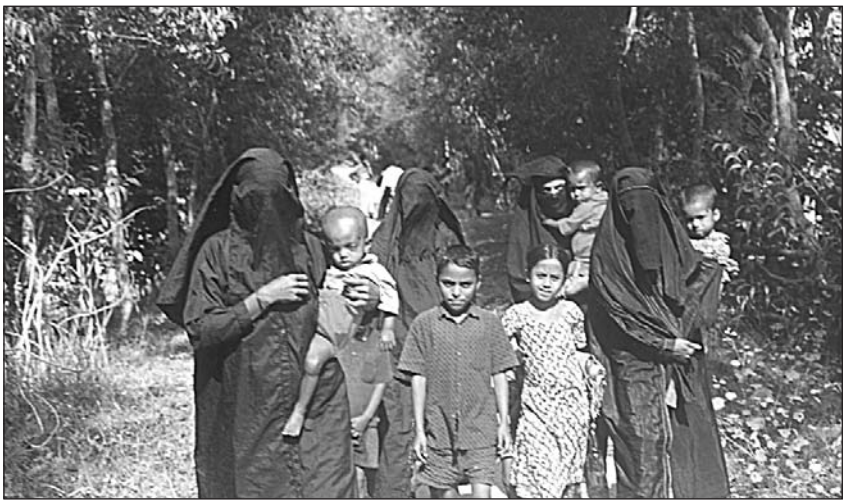

দস্যুদের ভয়ে চরাঞ্চলের নারীরা এতোদিন বাড়ি থেকে বের হতে পারতো না

জেলা পুলিশ সুপারের দেয়া তথ্য মতে, চলমান অভিযানে এ পর্যন্ত ১৮৬ জন ডাকাত ধরা পড়েছে। মারা গেছে ৪০-এর অধিক। তবে ৫ বাহিনীর কোনো সর্দারই ধরা পড়েনি।

চলতি অভিযানের আগেও কয়েকবার অভিযান চালানো হয়েছিল দস্যু নিধনের জন্য। গত বছর যৌথ বাহিনীও অপারেশন করেছিল। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, সে সবই ছিল লোক দেখানো। তাই সেগুলো সফল হয়নি। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ এবং শিল্পপতিরা অভিযোগ সফল হতে দেয়নি।

তবে এবার স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার অভিযান বেশ খানিকটা সফলতা পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই বনদস্যুদের গডফাদার হিসেবে পরিচিত কয়েকজনও দস্যু নিধনের জন্য উঠেপড়ে লাগেন। এদের দস্যু নিধনে আন্তরিক হওয়ার দু'টি কারণ রয়েছে-

প্রথমত চিড়িং মহলের নামে খাস জমি দখল। দস্যুদের নাহটালে সেটা এখন প্রায় অসম্ভব, কারণ বনদস্যুরা নিজেরা এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে কোনো কোনো গডফাদার কে ও আর পাত্তা দিচ্ছিলো না কোনো কোনো গডফাদার আবার দস্যুদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ায় দস্যুদের দ্বারা অপহৃত এবং শরীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে চরক্লার্কের বনদস্যু নইব্যা চোরার এককালের গডফাদার সাবেক আওয়ামী লীগার এবং বর্তমান বিএনপি নেতা সাহাবউদ্দিন নইব্যা চোরার বাহিনী কর্তৃক প্রহৃত হয়েছেন খাস জমি দখলের বিরোধকে কেন্দ্র করে।

চরলোঙ্গলিয়ার বনদস্যু বাশার মাঝি অপহরণ করে নিয়ে নির্যাতন করেছিল বাশার মাঝি বাহিনী যিনি গঠন করে দিয়ে ছিলেন সেই স্থানীয় বিএনপি নেতা লুৎফুর রহমান রেনু মেম্বারকে। এরা দু'জনই এখন দস্যু নিধনে নেতৃত্ব দিয়ে আবারও ফায়দা লোটার চেষ্টায় আছেন।

রেনু মেম্বারের সঙ্গে প্রতিবেদকের নিম্নরূপ কথা হয়।

সাপ্তাহিক ২০০০ : অভিযোগ আছে, আপনিই বাশার মাঝির দস্যু বাহিনী গঠন করেছিলেন, এখন আপনিই নির্মূলের কথা বলছেন।

রেনু মেম্বার : বাশার ছিল আমার চাকর। নব্বই দশকের শুরুতে হাতিয়ার কিছু জলদস্যু আমাদের অঞ্চলে এসে ডাকাতি করত। ওদের ঠেকানোর জন্য আমি বাশারকে গড়ে তুলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমার কথা শোনেনি। আমাকেই এখন মেরে ফেলতে চাচ্ছে। পরে আওয়ামী লীগ নেতা সেলিম চেয়াম্যানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়।

২০০০ : আপনি বাশার মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে এ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ টাকার বন উজাড় করে বিক্রি করেছেন?

রেনু মেম্বার : গাছ আমার লোকেরা কিছু

'গ্লোব এগ্রো'র (ইউরো কোলা) কিরণ , সরোয়ার মির্জা এবং আলামিন মির্জার মতো কয়েকজন, শিল্পপতি এ বনদস্যুদের সব রকম সহায়তা দিয়ে তাদের শক্তিশালী করেছে এবং জমি দখল করেছে'

আব্দুর রহমান *সভাপতি*
নোয়াখালী সদর উপজেলা বিএনপি এবং পিপি

'কয়েকজন শিল্পপতি এবং রাজনৈতিক নেতা বনদস্যুদের অর্থ, অস্ত্রসহ সব রকম সহায়তা দিয়ে আসছিল'

হাবিবুর রহমান *ওসি*
চরজব্বর থানা, নোয়াখালী

কেটেছিল কিন্তু গাছ কাটার সঙ্গে রাজনৈতিক নেতা এবং শিল্পপতিদের অনেকের মদদ ছিল।

স্থানীয় বিএনপি নেতা জামাল উদ্দিন গাজী (গাজী মেম্বার) ছিল দস্যু নইব্যা চোরার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, যার বিরুদ্ধে ৪০-৫০টি গাছ কাটার মামলা রয়েছে। তিনিও এখন দস্যু দমনে নেমেছেন। অথচ নইব্যা বাহিনীর ধৃত এক সদস্য মাসুম পুলিশ হেফাজতে ২০০০কে বলেছেন, তার বাবার মাধ্যমে গাজী মেম্বার নিয়মিত নইব্যা চোরার কাছ থেকে মাসোহারা নিত।

গত ১৩ ডিসেম্বর চরজব্বর থানায় গিয়ে দেখা যায়, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি এবং ১৭ নং চরভাটা ইউনিয়নের চেয়াম্যান খায়রুল আলম সেলিম বাশার বাহিনীর এক দুর্ধষ কমান্ডার মিয়া শিকদারকে ধরে এনে থানায় দিয়ে গেছে। এলাকাবাসী এবং পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি বিরোধী দলের লোক, নিজেকে বাঁচানো এবং অপরাধ ঢাকা দেওয়ার জন্যই তিনি এ নাটকটি করেছেন। এলাকাবাসী বলেছে, বাহিনী প্রধান বাশার দীর্ঘদিন থেকে সেলিম চেয়াম্যানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। গত সরকারের পুরো সময়টাই সেলিম চেয়াম্যানের ছত্রছায়া থেকেই বাশার বাহিনী সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছে। আর সেলিম চেয়ারম্যান বাশারকে ব্যবহার করে ভোটে জিতেছে এবং শতশত একর খাস জমি দখল করেছে।

সূত্র জানিয়েছে এককালের নৌকার মাঝি বাশার এবং দাগী চোর নইব্যা চোরা স্ব স্ব এলাকায় আওয়ামী লীগের লোক হিসেবে পরিচিত।

হাজার হাজার একর বনাঞ্চল এভাবেই উজার করেছে বনদস্যুরা, এখনো উজাড় হচ্ছে

অন্যদিকে এক সময়ের মহিষের রাখাল শফি বাতাইন্যা, ডাকাত জাহাঙ্গীর এবং সোলেমান কমান্ডার বিএনপি সমর্থক হিসেবে পরিচিত।

মূলত, এই দস্যুদের কোনো দল নেই। যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সে দলের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে। সরকারি দলের নেতারও তখন এই ডাকাতদের ব্যবহার করে খাস জমি দখলে নেয়।

রাজনৈতিক নেতা ছাড়া স্থানীয় কয়েকজন শিল্পপতি এদের ব্যবহার করে কয়েক হাজার একর খাস জমি দখল করে নিয়েছে চিংড়ি চাষের নামে।

নোয়াখালী সদর উপজেলায় বিএনপি সভাপতি এবং জেলা পিপি আব্দুর রহমান ২০০০কে বলেছেন, 'গ্লোব এগ্রো'র (ইউরো কোলা) কিরণ , সরোয়ার মির্জা এবং আলামিন মির্জার মতো কয়েকজন, শিল্পপতি এ বনদস্যুদের সব রকম সহায়তা দিয়ে তাদের শক্তিশালী করেছে এবং জমি দখল করেছে। তবে এই পিপি আব্দুর রহমানের সঙ্গে দস্যু শফি বাতাইন্যার সখ্যতার অভিযোগ আছে, কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেছেন।

বনদস্যুদের গডফাদার এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিএনপির জেলা পর্যায়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারির নেতাদের নাম পাওয়া যায়। যদিও স্থানীয় পর্যায়ে গুঞ্জন আছে, জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় রাজনীতির শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত চলে যেত বনদস্যুদের মাসোহারার টাকা কিন্তু তার কোনো প্রমাণ নেই। বিএনপির স্থানীয় পর্যায়ের যেসব নেতা যেমন রেনু মেম্বার, গাজী মেম্বার, সাহাবুদ্দিন, ফারুক চেয়ারম্যান, আল ফরিদসহ যাদের নাম পাওয়া যায় এরা সবাই আবার স্থানীয় সংসদ সদস্য মোঃ শাহাজাহানের ঘনিষ্ঠ। এজন্য অনেকে মনে করেন বনদস্যুদের কেউ কেউ হয়তো এমপি'র প্রশ্রয় পাচ্ছিল। সাংসদ স্থানীয় জালছেঁড়া নদীতে বাঁধ দিয়ে নদীর প্রবাহ বন্ধ করেছেন চিংড়িমহাল করার উদ্দেশ্যে। প্রায় ৩৫০ একর খাস জমি দখলে তিনি সরাসরি না গিয়ে স্থানীয় মেম্বার, চেয়ারম্যান এবং বনদস্যুদের কাজে লাগিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। যদিও তিনি ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এ অভিযোগ প্রপাগন্ডা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

বনদস্যুদের কাজে লাগিয়ে আরো যেসব রাজনৈতিক নেতা খাস জমি দখল করেছেন তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা হানিফ প্রফেসর এবং তার এক বেয়াই চরলক্ষ্মীতে প্রায় ৫০০ একর জমি দখল নিয়েছেন দস্যু নইব্যা চোরার সহায়তা নিয়ে। চৌমুহনী এলাকার আরেক আওয়ামী লীগ নেতা ডা. জাফরুল্লাহ ক্লোজা এলাকায় একইভাবে ৪০০ একর জমি দখল করেছেন। জাতীয় পার্টির নেতা এবং সাবেক সাংসদ ফজলে এলাহি দক্ষিণ বাগ্‌গা

বনদস্যু বাশার মাঝি এবং নইব্যাচোরার সীমানা বিরোধের কারণে এ বছর প্রায় ১০০ একর জমি চাষ করতে পারেনি কৃষকরা

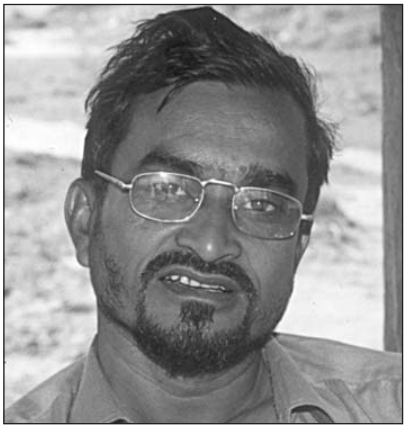

বাশার মাঝি বাহিনীর স্রষ্টা রেনু মেম্বার এখন নেমেছেন দস্যু নিধনে!

এলাকায় দস্যু শফি বাতাইন্যার সহায়তায় দখল করেছেন। ফজলে এলাহি এই দখলের কথা ২০০০-এর কাছে স্বীকার করেছেন, কিন্তু হানিফ প্রফেসর স্বীকার করেননি।

এছাড়া সবক'টি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় পর্যায়ের প্রথম, দ্বিতয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর বেশির ভাগ নেতাই যে যেখানে পেরেছেন বনদস্যুদের সহায়তা নিয়ে খাস জমি দখল করেছেন। বনদস্যুদের যেসব গডফাদাররা গড়ে তুলেছিলেন, অর্থ-অস্ত্র দিয়ে যারা লালন করছিলেন এবং দস্যুদের ব্যবহার করে যারা খাস জমি দখল করছিলেন তারাই এখন দস্যু দমনে নেমেছেন। স্থানীয়দের ধারণা, গডফাদাররা তাদের স্ট্যাটেজি পরিবর্তন করেছেন। তারা দেখছেন দস্যুরা এখন আর পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। অন্যদিকে সম্প্রতি এ এলাকায় প্রায় ১৩ হাজার একর খাস জমিকে চিংড়িমহাল হিসেবে ঘোষণা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই চিংড়িমহালের নামেই চলছে দখলের প্রতিযোগিতা। তাই গডফাদাররা ভাবছেন বনদস্যুরা যেহেতু এখন আর তাদের তেমন গ্রাহ্য করছে না, তাই তাদের উচ্ছেদ না করে চিংড়িঘের করা হলে তা দস্যুরা লুট করে নিয়ে যাবে। চিংড়িমহালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের বিনিয়োগ নিরাপদ করার জন্য এবারের অভিযান এতটা আন্তরিকতার সঙ্গে তারা পরিচালনা করছেন বলে স্থানীয়রা মনে করেন।

অভিযানের সময় পুলিশ দস্যুদের আস্তানা থেকে কয়েকটি ডায়রি এবং টেলিফোন ইনডেক্স উদ্ধার করেছে। তাতে লেখা আছে জেলা পর্যায়ের কিছু রাজনৈতিক নেতা, শিল্পপতিদের মোবাইল এবং টেলিফোন নম্বর। এছাড়া ডায়রিতে আছে কাকে কত তারিখে কত মণ ধান অথবা টাকা দিয়েছে। এসব সূত্র ধরেও যদি তদন্ত করা হয় তবে মুখোশ খুলে যাবে শহরে বাস করা অনেক ভদ্রবেশী দস্যু গুরুদের নাম। এটা এখন নোয়াখালীবাসীর দাবি।

অভিযান যে কারণে হোক, ডাকাতরা পুরোপুরি নির্মূল না হলেও তাদের মূল আস্তানাগুলো ভেঙে দেয়া হয়েছে তাদের দৌরাত্ম্য কমেছে। এতে এলাকার ২ লাখ মানুষের চোখেমুখে এক রকম স্বস্তি দেখা যায়। তবে দু'ধরনের আশঙ্কা তাদের মনে এখনো আছে। প্রথমত, যেহেতু মূল নেতারা কেউ ধরা পড়েনি এবং বেশির ভাগ দস্যুই এখনও গভীর বনে আত্মগোপন করে আছে, তারা যেকোনো সময় আবার সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ করতে পারে। বিশেষত যারা দস্যু নিধনে সরাসরি অংশ নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, অভিযান শুরু হওয়ার পর অধিকাংশ দস্যু দুর্গম বনে পালিয়ে গেছে। বন এতো দুর্গম এবং বিশাল যে, গেরিলা কায়দায় অভিযান ছাড়া এদের পুরো নির্মূল করা সম্ভব নয়।

অন্য আরেকটি আশঙ্কা করা হচ্ছে, একটি বাহিনী নিধন হচ্ছে কিন্তু এই নিধনের ধোয়া তুলে সাদা বাহিনী নামে আরেকটি বাহিনী গড়ে উঠছে, যাদের নেতৃত্বে আছে বিএনপি সমর্থক কিছু সন্ত্রাসী এদের কেউ কেউ আবার আগে দস্যুদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ছিল। এদের মধ্যে আমান উল্লাহ বুলু, শাহাব উদ্দিন আমিন, গাজী মেম্বার, রেনু মেম্বার এবং শাহাবুদ্দিনের উত্থানেও শঙ্কিত মানুষ।

ছবি : **খালেদ সরকার**